ছোটদের বাংলা সাহিত্য

✪ ভূমিকা :

সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার সেই প্রবীণদল ও বাহক সেই যুবসম্প্রদায়, তাদের কল্যাণ, স্বার্থ সমাজকে অবশ্যই দেখতে হবে। নচেৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু আজিকার সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও, আগামীকালের সমাজ ও রাষ্ট্রের রঙ্গমঞ্চে যারা যুবসম্প্রদায় ও প্রবীণদলের ভূমিকা অভিনয় করবে, স্ফুটনোন্মুখ সেই কিশোর, বালক, শিশুদলের ভবিষ্যৎ গড়বার উপযোগী ছোটদের সাহিত্য রচনা করা দরকার। কলমের লাঙ্গলে মনের মাটি চষিয়া ভাব ও ভাবনার ফসল উৎপাদন করাই যাঁহাদের কাজ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিশোর-মনের নুতন মাটিকে নিয়েও নিড়ানি দিয়ে থাকেন আর তাঁহারাই শিশু সাহিত্যিক।

✪ ছোটদের সাহিত্যরচনার লক্ষ্য :

সাহিত্যরচনার লক্ষ্য নিয়ে বাদ্‌বিতণ্ডার অন্ত নাই, কিন্তু সকল বাদ্‌বিতণ্ডাকে অতিক্রম করে একটি কথা অন্ততঃ স্থায়ী স্বীকৃতি পেয়েছে যে, সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। তাই কচি মনের মাটি কাঁচা বলে তা নিয়ে অনায়াসে একটি পেটেন্ট ছাঁচের ভিতরে ফেলে রূপ দেওয়া চলে না। ছোটদের সাহিত্যরচনার কোন বিশিষ্ট আদর্শের সন্ধান, কোন ধরাবাঁধা পথ দেখিয়ে দেওয়ার বিরোধী তাই অনেকেই। এক দিকে যেমন একদল শিশু-সাহিত্যিক মনে করেন, ছোটদের সাহিত্য বলতে অবাধগতি কল্পনার আকাশ-পরিক্রমা ছাড়া আর কিছুই নয়, অপর দিকে তেমনি আজকের দিনের রূঢ় বাস্তবের আঘাতে জর্জরিত আর একদল সাহিত্যসেবী জানিয়েছেন, দুঃখ জিনিসটি জীবনের মর্মমূলে এমন করেই আঘাত হানিয়ে থাকে যে, দুঃখের স্বরূপ চিনিয়া প্রকৃত কল্যাণের পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারটি ছেলেবেলা হতেই প্রয়োজন। কিন্তু কথাটি এই যে, পরিণতবয়স্কের চলার-পথে যে ঘাত-প্রতিঘাতের ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উপছাইয়া পড়ে, তাহার ভিতরে ছোটদের টানিয়া আনা শুধু যে অর্থহীনই তাহা নয়, অনর্থকরও বটে। পক্ষান্তরে, ছোটদের মনই তো কল্পনাশক্তি প্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং এই শিশু অবস্থা হতেই কল্পনাশক্তির স্ফূর্তি ও পূর্তি না ঘটলে পরবর্তী জীবনে কোন বড় সৃষ্টিই গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং কল্পনার বিস্তৃতি ও ঘনতাই যে ছোটদের সাহিত্যরচনার লক্ষ্য, একথা বলাই বাহুল্য।

✪ ছোটদের সাহিত্যের উপাদান :

বৈচিত্র্য নিয়েই জীবন। এক দিকে যেমন প্রাণখোলা নির্মল হাসির মূল্য আছে, অপরদিকে তেমনি মূল্য আছে মর্মস্পর্শী কান্নারও। কান্না-হাসি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের দোলায় না চড়িতে পারিলে মনের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কোনটিরই স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা দেয় না। অপরের বেদনাকে নিজের অন্তরের মাঝে উপলব্ধি করবার সুযোগ দেওয়া তো সাহিত্যকারের কাজ। এমনই তো জীবন স্বার্থপরতার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ, তাকে ছিন্নভিন্ন করে যদি পরার্থপরতার সমুচ্চ শিখরের দিকে মানুষের লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত না হয়, তা হলে জীবনের মূল্যবোধও তো ঘটে না। তাই ছোটদের সাহিত্যের উপাদান হিসাবে হাসি ও কান্নার প্রবাহকে অস্বীকার করা চলে না। রাজপুরী হতে বিতাড়িত-রাণী ও ছোটরাণী তাহাদের সন্তান বুদ্ধভুতুমকে নিয়ে কাঠ কুড়িয়ে দুঃখের দিনগুলি চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেও, তাহা জীবনের সার্থকতার সন্ধানে ছুটতে কসুর করে না। একদিন দেখা যায়, ঐ অবহেলিত বুদ্ধভুতুমই বীরত্বের সাধনা লাভ করে অতুলনীয় ঐশ্বর্য, ফিরে পায় পিতার স্নেহ, আনে মায়ের সুখ। জগতে এমনি করেই তো ঘটে অন্যায়ের অবসান অবিচারের অবলুপ্তি। কল্পনার প্রসার এমনি রকমের বিষয়বস্তুর মধ্যেই তো সব চেয়ে

বেশি করেই খেলে। এই পথেই চলেছেন 'গালিভার', চলেছেন 'এলিস', চলেছেন 'ডন কুইক্‌সোট'। আবার 'রাজপুত্তুর' 'কোটারপুতুর', 'তিল তিল মিতিল' সবাই চলেছে এই পথ দিয়েই। সমাজের ক্লেদ, মালিন্য, নীচতার পঙ্কসমুদ্র মন্থন করেই অমৃতের সন্ধান পাওয়া—এই কাজটি বড়দের সাহিত্যে থাকিবে সত্য, কিন্তু ভয়ের প্রতিকূলে নির্ভীকতা, হিংসার প্রতিকূলে ক্ষমা, ক্রোধের প্রতিকূলে প্রেম যেখানে প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে ছোটদের মনকে পুষ্ট করবার উপকরণ যে তাতে আছে, একথা বলাই বাহুল্য। তাই বিশ্বের কল্যাণমুখী সাহিত্য-মাত্রকেই—হোক্ না কেন তাহা বড়দের জন্য লেখা—ছোটদের উপযোগী করেই পরিবেশন করা চলে। ইহার প্রমাণ 'ছোটদের মহাভারত', 'ছোটদের পথের পাঁচালী', 'ছোটদের বিষাদসিন্ধু', 'ছোটদের আনন্দমঠ' ইত্যাদি। কিন্তু বস্তিজীবনের জঘন্য পরিবেশ, বাস্তবজীবনের কঠিন সংঘাত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের ঐতিহাসিক অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোটরা শুধু তাচ্ছিল্য, শুধু অবহেলা, শুধু ব্যথাই লাভ করে, তাহাদের জীবনে 'নীলপাখী'র স্বপ্ন দেখা পরিহাসেরই নামান্তর। তাই ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে, কল্যাণের পথে ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোটদের উদ্বুদ্ধ করার যে সাহিত্যিক আদর্শ, তাহাকে একান্তভাবে মানিয়ে নেবার দিন আজ এসেছে। মুনাফাখোর কালোবাজারী ধ্বজাধারী কোন ধনীর ছেলে প্রতিবেশী গরীবের ছেলেমেয়েদের ব্যথার সমব্যথী হয়ে যদি মজুত চালের খবর সর্বজনসমক্ষে প্রকাশই করে দেয়, তাহাতে ক্ষুদ্রতর পরিবেশে পিতৃদ্রোহিতা প্রকাশ পাইলেও বৃহত্তর পরিবেশে অর্থাৎ, সমষ্টির কল্যাণে ছোটর এই যে বীরত্ব—ইহার স্বীকৃতি আজকের ছোটদের সাহিত্যে ফুটিয়ে ওঠা দরকার। এমনি করেই বাস্তব জীবনের সঙ্গে ছোটদের সাহিত্যের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়া যেতে পারে। পৌরাণিক যুগেও তো পুত্র প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুর বিরোধী হয়েছে। আজই-বা সাহিত্যের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে আমাদের ঘরে ঘরে নব নব প্রহ্লাদের আবির্ভাব ঘোষিত হবে না কেন?

✪ আমাদের মাতৃভাষায় ছোটদের সাহিত্যের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি :

মনে হতে পারে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। 'চয়ন' ও 'সংগ্রহ' ধরনের যে সকল পুস্তক বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়ে থাকে, তাহাদের পদ্যাংশে যদিও-বা কিছুটা সাহিত্যোপভোগের আনন্দ মিলে, গদ্যাংশে তো তা আশা দুরাশারই নামান্তর। পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাব ও বিষয় এতই সীমাবদ্ধ এবং পাঠনপদ্ধতিও এতই প্রাচীন যে সুপরিসর সাহিত্যের বিরাট প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীরা আদৌ উপনীত হতে পারে না। আবার এমনও দেখা যায়, শিশুকে পূর্ণবয়স্ক মানুষের অপরিণত সংস্করণ হিসাবে ধরে নিম্নশ্রেণীর গল্প পরিবেশিত হয়ে থাকে। অধম জাতের সস্তা লোমহর্ষক কাহিনীগুলোর বাজে ও সুলভ সংস্করণের প্লাবনে ছোটদের সাহিত্য আজ প্লাবিত। এই কি ছোটদের সাহিত্যের সত্যকার পরিচয়? কিন্তু শিশুমনেরও আছে পূর্ণতা, আছে ভাববৈচিত্র্য। পূর্ণবয়স্ক মানুষের একটি ছোট অপরিণত সংস্করণ হিসাবে শিশুকে দেখলেই চলবে না। শিশু—সে তো পূর্ণ-পরিণত শিশুই। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর—জীবনের এই প্রতিটি স্তরেরই আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব বৈচিত্র্য, নিজস্ব পরিপূর্ণতা। ছোটদের সাহিত্যক্ষেত্রেও শিশু, বালক ও কিশোরর মানসিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আলাদা আলাদা তিনটি পূর্ণপরিণত স্তর থাকা প্রয়োজন। আমাদের ছোটদের সাহিত্যে এই বিভাগত্রয় নাই বললেই চলে। শিশু ও বাল-সাহিত্যে কিছুটা থাকলেও কিশোরসাহিত্যের অভাব খুবই বেশি। নিখিল বিশ্বের সকল স্থানেই ছোটদের সাহিত্য মোটামুটিভাবে বর্তমান যুগের সৃষ্টি। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের গোড়ার দিকে ইংরাজিতে ছোটদের সাহিত্যকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে আমাদের ছোটদের সাহিত্যের উদ্ভব। বিদ্যাসাগরের 'কথামালা', অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ', মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' মনোমোহনের 'পদ্যমালা' প্রভৃতি ছোটদের পাঠ্য ও 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'কাদম্বরী', 'রামের রাজ্যাভিষেক', 'টেলিমেকস' প্রভৃতি আরও একটু বড়দের পাঠ্য করেই লিখতে হয়েছিল। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির অধিকাংশই উপদেশমূলক এবং ভাষাও বেশ নীরস এবং কঠিন। সে যাই হোক্—আমাদের মাতৃভাষায়

ছোটদের সাহিত্যের উৎপত্তি ঘটিয়েছে শতবর্ষের কিছুটা পূর্বে। গদ্য এবং পদ্য—উভয় রীতিতেই খণ্ডিত বাংলায় ছোটদের সাহিত্য রচিত হয়েছে। ছোটদের মানসিক আহার যাহারা বর্তমানে সরবরাহ করেছেন, তাহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো) ননীগোপাল চক্রবর্তী, বিমল ঘোষ (মৌমাছি) প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং পূর্ববঙ্গবাসী জসীম উদ্‌দীন, বন্দে আলী মিঞা, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ মাদাব্বের, আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, তালিম হোসেন, হাবীবুর রহমন, শওকত ওসমান, আহ্‌সান হাবীব, শামছুন নাহার, হোস্‌নে আরা প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

✪ শিশুসাহিত্য :

শিশুমনের সত্যকার ছবিটি ছোটদের আধুনিক কবিতা অপেক্ষা ছড়াগুলিরই মধ্যে অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন কালের 'ছেলেভুলানো ছড়া'র পরেই আধুনিক কালে রচিত ছড়াজাতীয় ও অভিনয়াত্মক কবিতা-পুস্তকের নাম করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ', উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাতের জন্মকথা', গুরুসদয় দত্তের 'ভজার বাঁশী', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হিজিবিজি' ও 'হাসিখুসি', সুখলতা রাওয়ের 'পড়াশুনা', সুনির্মল বসুর 'ছন্দের টুংটাং', নজরুল ইসলামের 'ঝিঙে ফুল', গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লাল-কালো' প্রভৃতি বইগুলির ছবি যেমন মজার মজার, তেমনি সুন্দর চক্‌চকে। অতীতে শিশুপাঠ্য গ্রন্থহিসাবে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতির খুব সমাদর ছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রাচীন ছড়াবই ন্যায় ঐ প্রাচীন গল্পগুলিও প্রায় অবলুপ্ত। গল্পগুলির লিখনরীতি আধুনিক রুচিসম্মত না হলেও শিশুমনের তার বিষয়বস্তুর আবেদন খুবই বেশি। পক্ষান্তরে, বাংলা পল্লীকাহিনীর সংগ্রহ হিসাবে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনীর বই', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল', ইংরাজি পরীকথার অনুসরণে লিখিত অথবা অনুবাদিত পুস্তক হিসাবে সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই' 'আরও গল্প' ও পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশী', বন্দে আলী মিঞার 'চোর জামাই', 'গল্পের আসর' ও 'মেঘকুমারী', আশরাফ সিদ্দিকীর 'কাগজের নৌকা', কাদের নওয়াজের 'দাদুর বৈঠক', শেখ হাবীবুর রহমানের 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' প্রভৃতি বেশ খ্যাতি লাভ করেছে।

✪ বালকসাহিত্য :

রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' প্রকৃতপক্ষে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ নয় সত্য, কিন্তু 'শিশু'র বহু কবিতায় এবং 'শিশু ভোলানাথে'র কয়েকটিতে শিশুমনের ছবি অবিকৃত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শিশুর ছেলেখেলার কথাটি এমনই সস্নেহ কৌতুকের সঙ্গে কবিতাগুলিতে বিবৃত হয়েছে যে, ইহারা বালকদের খুবই উপভোগ্য। সুকুমার রায়-এর 'আবোল-তাবোল' আজও অবধি বালকপাঠ্য হাসির কবিতার বই হিসাবে স্বনামধন্য সুনির্মল বসুর কয়েকটি কবিতাতেও এই সুর লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র সচিত্র লিমারিকের বই। শেখ হাবীবুর রহমানের লেখা 'হাসির গল্প' ও 'সুন্দরবন-ভ্রমণ' বই দুইখানি বালকদের অতি প্রিয় বালকদের জন্য দেশবিদেশের নানা কাহিনী ছাড়াও নানা দেশের পুরাণ ও উপদেশের গল্পও রচিত হয়েছে। 'জাতকের গল্প', 'গ্রীক্ পুরাণের কাহিনী', 'ঈশপের গল্প', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'পুরাণের গল্প', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'মহাভারতের গল্প', 'টুক্‌টুকে রামায়ণ' প্রভৃতির নাম এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। আবার সাঁওতাল, হো প্রভৃতি ভারতীয় আদিবাসীদের কাহিনীও আমাদের ছোটদের সাহিত্যের উপকরণ যেমন— 'সাঁওতালী উপকথা', 'হোদের গল্প', হিন্দুস্থানী গল্পের সংকলনগ্রন্থ 'হিন্দুস্থানী উপকথা' এবং 'আরব্যপন্যাস', 'আলাদিনের প্রদীপ' 'নাবিক সিন্দবাদ' প্রভৃতি আরবী ফার্সী পুস্তকাদির বাংলা সংস্করণ বালকদিগের নিকটে বেশ উপভোগ্য। প্রিয়ংবদা দেবীর 'পঞ্চুলাল', সীতা-শান্তা দেবীর 'আজব দেশ' ও 'হুক্কাহুয়া' ইংরাজী গল্প-অবলম্বনে রচিত হলেও শিশুর মনে, এমন কি বালকদেরও মনে, অফুরন্ত আনন্দের উৎস খুলে দেয়।'

✪ কিশোর সাহিত্য :

শিশুমনে অপূর্ব ভাববৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এমন ধরনের কল্পনাপ্রধান সাহিত্য-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থটির তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও পাওয়া দুষ্কর। ইহার সূক্ষ্ম রস পুরোপুরি উপভোগ করবার ক্ষমতা একমাত্র কিশোরদেরই আছে, শিশুদের নেই। সুকুমার রায় 'হ-য-র-ল-ব' ও লীলা মজুমদারের 'বদ্যিনাথের বড়ি' এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। বাংলায় কিশোর-সাহিত্যের অভাব খুব বেশি করে অনুভূত হয়। ছোটদের উপযোগী উপন্যাস সাহিত্য বিশেষ নাই। পক্ষান্তরে, ইংরাজিতে এই শ্রেণীর উপন্যাসে খুবই কদর। অতীতের লেখা 'অনাথ', 'উত্তরাধিকারী'র মত ছোটদের উপন্যাস আজকাল আর দেখা যায় না। শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে লেখা 'ছেলেবেলার গল্প' কিশোরদের উপযোগী। সুকুমার রায় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'ঝালাপালা', রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ধূপের ধোঁয়া', আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর 'লাষ্ট্ বয়্' প্রভৃতি নাটক ছোটদের অভিনয়োপযোগী ভাল নাটক। ছোটদের মনে ঐতিহাসিক চেতনা জাগিয়ে তুলবার পক্ষে 'রাজকাহিনী', 'রণডঙ্কা', 'তান্তিয়ার বাহাদুরী', 'বিশে ডাকাত', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর 'ইতিহাসের সোনার পাতা' গ্রন্থগুলি খুবই মূল্যবান। বালসাহিত্যে ও কিশোরসাহিত্যে এ্যাড্‌ভেঞ্চার শ্রেণীর উপন্যাসেরই প্রচলন সর্বাপেক্ষা অধিক। এটি দুইটি শ্রেণী—প্রথম, বিদেশী রোমাঞ্চকর কাহিনীর অনুবাদ অথবা অনুকরণ এবং দ্বিতীয়, মৌলিক রচনা। অসম্ভব কাল্পনিক ভৌতিক ধরনের এই গল্পগুলি কল্পনাবিলাসী বাঙ্গালী জাতির পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়। এই জাতের সস্তা খেলো বই—যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'পেনী ড্রেড্‌ফুল'—তাহা সাহিত্যের দিক দিয়ে সত্যই 'ড্রেড্‌ফুল'। বাংলা ও অপরাপর ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে ছেলেদের পরিচিত করার জন্য 'ছোটদের দেবী চৌধুরাণী', বিভূতিভূষণের 'আম আঁটির ফেঁপু', 'টলষ্টয়ের কাহিনী', 'সেক্‌স্‌পীয়রের গল্প' প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও 'পোকামাকড়', 'গাছপালা', 'জীবজন্তু', 'গ্রহ-নক্ষত্র', 'বিশ্ব পরিচয়', 'জ্ঞানবিজ্ঞানের কি ও কেন', 'বলতো?' প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পর্কিত পুস্তক ও 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ', 'পৃথিবীর সেরা সাহিত্য' প্রভৃতি ইতিহাস সম্পর্কিত পুস্তকাদিও ছোটদের সাহিত্যে অল্পস্বল্প দেখা দিয়াছে। নিছক ছোটদের উপযোগী ভ্রমণকাহিনী অতি অল্পই আমাদের আছে। এখনও দেশ বিদেশের ছোটদের খবর আমরা বড় একটা পাই না।

✪ ছোটদের সাময়িক পত্রিকা :

ছোটদের জন্য সাময়িক পত্রিকারও প্রয়োজন। বিভাগপূর্ব বাংলায় প্রথম ছোটদের মাসিকপত্র ছিল প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' এবং ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী'—পরে উভয়ের মিলিত নাম হয় 'সখা ও সাথী'। 'মুকুল', 'সন্দেশে'র পরেই 'মৌচাক', 'শিশুসাথী', 'রামধনু', 'রংমশাল', 'শিশু সওগাত', 'শুকতারা', 'আনন্দ মেলা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। সুখের বিষয় পূর্ব-পাকিস্তানে 'ঝংকার', 'মিনার', 'হুল্লোড়' প্রভৃতি শিশু মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু মাসিক পত্রিকা কয়েকখানি থাকলেও ছোটদের দৈনিক সংবাদপত্র খণ্ডিত বাংলার কোন অঞ্চলেই একখানিও নাই। অথচ, সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিশ্বজগতের সঙ্গে বালক ও কিশোরদের পরিচয় হওয়া দরকার। বড়দের খবরের কাগজের অংশবিশেষে যেটুকু আলোচনা থাকে, তাহা আদৌ যথেষ্ট নয়। তবে, একেবারে যেখানে ছোটদের অন্য কোন বিশেষ দৈনিক পত্রিকা নাই, সেখানে এই ব্যবস্থাটিও মন্দের ভালো। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা আছে, কিন্তু তাহা পরিচালনার অভাবে ঠিক ছোটদের সাহিত্যের উপকরণে সমৃদ্ধ নয়। আবার এমন বিদ্যালয়ও দেখা যায়, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তরফ হতে বাধাই সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

উত্তর ঃ বাংলা শিশু সাহিত্য যাঁকে ছাড়া অসম্পূর্ণ তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শিশু সাহিত্য রচনা বা 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা রূপে শুধু নন, সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা-বিজ্ঞান সকল বিষয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন তিনি। রায়চৌধুরী পরিবারের এই প্রাণপুরুষ শুধু নিজেই নন, তার ভাই কুলদারঞ্জন পুত্র সুকুমার, পৌত্র সত্যজিৎ, সুখলতা রাও, লীলা মজুমদার সকলে মিলে শিশু সাহিত্যের জগতকে ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থের 'বাংলা শিশু সাহিত্য' প্রবন্ধে তাই লিখেছিলেন–

> ".....সেই বিস্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে -একটিমাত্র পরিবারের আসন, মাত্রা-ভেদ যত বড়োই হোক না, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরেই কোন একটা সময়ে এ রকমও আমাদের মনে হয়েছিল যে বাংলা শিশু সাহিত্য এই রায়চৌধুরীদেরই পারিবারিক এবং মৌরশি কারবার ভিন্ন কিছুই নয়। উপেন্দ্র কিশোর এই উজ্জ্বল যুগের আদি পুরুষ।"

উপেন্দ্রকিশোরের ঐকান্তিক আগ্রহেই বাংলা শিশু সাহিত্যের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটে। ছড়া ও ছবিতে রামায়ণ, মহাভারত ছাড়াও শিশুদের জন্য উপেন্দ্রকিশোরের সৃষ্টির সম্ভার এরূপ–

ক. সেকালের কথা (১৯০৩ খ্রিঃ) :

এতে পুরোনো দিনের জীবজন্তু বিষয়ে সচিত্র আখ্যান পাই।

খ. টুনটুনির বই (১৯০০ খ্রিঃ) :

এটি সাতাশটি লোক কাহিনির সংকলন।

গ. পুরাণের গল্প :

ছাব্বিশটি পৌরাণিক কাহিনির সংকলন।

ঘ. সন্দেশ :

শিশু-কিশোর পত্রিকা, যা মাসে মাসে প্রকাশিত হত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা শিশু সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা রামায়ণ, মহাভারত সহ নানা পৌরাণিক কাহিনি রচনায় ব্যপ্ত ছিলেন। প্রাচীন ভারতের গৌরব, ঐশ্বর্য, মহিমার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করানোই ছিল এ জাতীয় রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ সময়কে অস্বীকার করতে পারেননি উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর রচিত 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৮৯৪-৯৫) 'ছেলেদের মহাভারত'

(১৮৯৫ খ্রিঃ), 'মহাভারতের গল্প' (১৯০৯ খ্রিঃ), 'ছোট্ট রামায়ণ' (১৯১৯ খ্রি:) এবং পুরাণের গল্প' (সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯১৩) সেই উদ্দেশ্যগুলিকেই পূরণ করেছিল। মুখ্যত শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত হওয়ায় উপেন্দ্রকিশোর গ্রন্থগুলি প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা করেছিলেন। 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারতে' যেসব কাহিনি তাঁর বলা হয়ে ওঠেনি তা সংক্ষিপ্ত পদ্যরূপ দিয়ে তিনি প্রকাশ করেন ছোট্ট রামায়ণ' এবং 'মহাভারতের গল্প' গ্রন্থে। বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দ, বীর-হাস্য-রৌদ্র- ভয়ানক করুন ক;রসের সমাবেশে এবং সহজ সুললিত ভাষা প্রয়োগে তিনি শিশুদের মনের কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছিলেন শিবপুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণের বিশাল কাহিনি ভাণ্ডার থেকে তথ্য-গল্প সংগ্রহ করে তিনি শিশু কিশোরদের উপহার দিয়েছিলেন 'পুরাণের গল্প'।

সংখ্যায় অল্প হলেও সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'খুকুমণি', 'রেলগাড়ির গান', 'চাঁদের বিপদ', 'যখন বড় হব', 'সুখের চাকরী', 'বাবার চিঠি', 'প্রার্থনা', 'শিশুর কথা', 'কমলা নাপিত', 'পাখির গান' 'গ্রীষ্মের গান' প্রভৃতি কবিতাগুলি শিশু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশুদের শৈশবের নানা ক্রিয়াকলাপ, শিশুর প্রতি পিতার স্নেহ, ঈশ্বরের প্রতি শিশুদের আনুগত্য প্রভৃতি বিষয়গুলিতে সমৃদ্ধ উক্ত কবিতাগুলি।

'সন্দেশ', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকায় সহজ সরল রীতিতে উপেন্দ্রকিশোরের প্রায় পঞ্চাশটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকরসের স্পর্শে এবং বৈচিত্র পূর্ণ বিষয়বস্তুতে লেখা উপেন্দ্রকিশোরের গল্পগুলি আজও শুধু শিশু-কিশোরদের নয়, বয়স্কদের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য। এর মধ্যে চিরস্মরণীয় বাংলা উপকথাকে নিয়ে লেখা 'টুনটুনির বই'। সাতাশটি লোকপ্রচলিত উপকথা পত্রিকায় প্রকাশের সময় সাধুরীতি এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কথ্য ভাষারীতিতে স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' 'ঘ্যাঘাসুর' 'জোলা আর সাত ভূত' 'সাতমার পালোয়ান' 'ভূতো আর ঘেঁতো', 'পাঁকা ফলার' 'দুষ্টু দানব' প্রভৃতি গল্পগুলির শিশুচিত্তকে জয় করেছে অতি সহজে। রূপকথার পাশাপাশি 'ঠাকুরদা' 'ঠানদিদির বিক্রম' 'চালাক চাকর', 'কাজীর বিচার', 'বুদ্ধিমান চাকর' প্রভৃতি গল্পে কৌতুকরসের পরিবশেন অনবদ্য ভঙ্গিমায় ঘটেছে। গল্পগুলির ভাষা ভঙ্গিমায় ঘটেছে। গল্পগুলির ভাষা ভঙ্গিমায়। প্রকাশ পেয়েছে সারল্য এবং অভিনবত্ব। টুনটুনির বই এর চোদ্দটি গল্পে শিয়াল, এগারোটি গল্পে বাঘ, তিনটি গল্পে হাতি ও কুমির ও বিড়ালের উপস্থিতি, রকমারি পাখ বিশেষত্ব প্রবল বুদ্ধির অধিকারী টুনটুনি যেভাবে উপেন্দ্রকিশোর লেখনী স্পর্শে উপস্থাপিত তা শিক্ষণীয় এবং প্রসংশনীয়। আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র টুনটুনি যেভাবে প্রভাবশালী রাজ্যকে বলতে পারে–

"নাক-কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে!"

কিংবা টুনটুনিকে ভয় পেয়ে–

"রাজা ভারি ভয় পেল
টুনটুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।"

বিষয়টি শিশুরা আনন্দ করে পড়ে ফেললেও বড়োরা বুঝতে পেরেছে। নাপিত দাদা, বিড়াল ভাই, লাঠি ভাই, বাঘের মামা নরহরিদাস, উকুনে বুড়ি, পান্তা বুড়ি, বোকা জোলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি অমর হয়ে থাকবে সাহিত্যের পাতা থেকে মানব মনে। বলা যেতে পারে তার লেখনী স্পর্শে বাংলা শিশু সাহিত্যের যে স্বর্নযুগ শুরু হয়েছিল তা তাঁর পরিবারের উত্তরসূরী এবং পরবর্তী অন্যান্য শিশু সাহিত্যিকদের কাছে প্রেরণা স্বরূপ হয়েছে। তাই বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সব গুণ সম্পন্ন এই মানুষটির অবদানকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না কোনো কালেই।

পুরাকথার মানবায়ন ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুরাণের গল্প

অয়ন মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে বুঝতে 'পুরাণ' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি উপাদান। ভারত-সংস্কৃতির আদিপর্বের ইতিহাস আজও এই পুরাকথার গর্ভে নিহিত। পরম্পরার দৃষ্টিতে পুরাণ তাই কেবল ধর্মশাস্ত্র নয়; ইতিহাসের আশ্রয়। প্রাচীন সাহিত্যে পুরাণকে তাই বারংবার 'পুরাণেতিহাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতায় পৃথক 'ইতিহাস' নামক বিদ্যাশৃঙ্খলা গড়ে না ওঠার অন্যতম কারণ হল, এই পুরাণ। পুরাণের 'বংশানুকীর্তন' ও 'মন্বন্তরে'র মধ্যে দিয়েই ইতিহাসের ধারা প্রাচীন ভারতে প্রবাহিত হত। ভারততত্ত্বের অশেষ বিদ্যাবিদ মহামহোপাধ্যায় কানে তাই বলেন:

"Taken Collectively, they may be described as a popular encyclopedia of ancient and medieval Hinduism, religious, philosophical, historical, personal, social and political."[১]

'পুরাণ' শব্দের ব্যাখ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা প্রথম যে অর্থটি উপস্থাপন করছেন তা হল—"পুরাভব, পুরাতন, চিরন্তন"[২]। অর্থাৎ পুরাণ এক অর্থে আমাদের সভ্যতার আদিতম কালের শাশ্বত-বাণীটিকেই বহন করে চলেছে। তুলনায় সাধারণ্যে ধর্মশাস্ত্র হিসাবে যে অর্থে 'পুরাণ' শব্দটি প্রচলিত তাও তিনি নির্দেশ করেছেন।

"ব্যাসাদি রচিত পঞ্চলক্ষণ শাস্ত্রবিশেষ...
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।
বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।"[৩]

এই পাঁচটি লক্ষণ পুরাণের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। 'সর্গ' শব্দের অর্থ সৃষ্টি। 'প্রতিসর্গ' শব্দের অর্থ প্রলয়কালে পূর্ব সৃষ্টি ধ্বংসের পর নতুন সৃষ্টির বিকাশ। 'বংশ' শব্দের অর্থ দেবতা ও ঋষিদের বংশের বর্ণনা। 'মন্বন্তর' শব্দের অর্থ মনুগণের শাসনকাল এবং 'বংশানুচরিত' শব্দের অর্থ নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস। এই পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই পুরাণের আখ্যানগুলি আবর্তিত হয়েছে। মৎস্যপুরাণ মতে আবার পুরাণের লক্ষণ ছয়টি:

"উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব বংশান মন্বন্তরানি চ।
বংশানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্।।
দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পঞ্চ শাশ্বতম্।
বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্।।
দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চানৎ বিদ্যতে ভুবি।
তৎ সর্ব বিস্তরেন ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতু মর্হসি।।"[৪]

এখানে আমরা দেখি, পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সমকালের সাধারণের জীবন। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে ব্যক্তিগত জীবনাচরণ ছিল ধর্মশাস্ত্রের মুখাপেক্ষী। এই বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্ভুক্তি পুরাণের পরিধির মধ্যে নিয়ে এল আমাদের পূর্বপুরুষের ধুলো-কাদা-মাখা জীবনকে। মানুষের মুখরিত সখ্যে দেবলোকের অখণ্ড পবিত্রতা ভেঙে তৈরি হল এক মানবিক ধর্মশাস্ত্র। যেখানে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য হাত ধরাধরি করে চলে। নিয়মের গণ্ডির বাইরে পা রাখলে শাস্তি পেতে হয়, কখনও বা 'উত্তরের জানলা খুলে দেওয়া'র কথাও ঢুকে পড়ে নানা আখ্যানের মধ্য দিয়ে।

পুরাণের এই মানবিক মুখের কথা মাথায় রেখেই আমরা উপেন্দ্রকিশোরের পুরাণের গল্পগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব। কারণ, উনিশ শতকের শেষলগ্নে দাঁড়িয়ে উপেন্দ্রকিশোর যে পুরাণকে ফিরে দেখেন, তা একান্তভাবে মানবিকতার জয়পতাকাকেই উড্ডীন করতে চায়। পুরাণ রচনার প্রাথমিক ব্রাহ্মণ্য 'রাজনীতি'কে, সমাজবিধিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

সমান্তরাল ভাবে একথাও মনে রাখা দরকার যে, উপেন্দ্রকিশোরের মূল পাঠক শিশুরা। সমাজের নানা নীতি-রীতি-রাজনীতির জটিল আবর্তে তাদের মন তখনও পঙ্কিল হয়ে ওঠেনি। একদিকে তাদের মধ্যে কাজ করছে অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে সবার অলক্ষ্যে গড়ে উঠছে তাদের চেতনার জগত। যে চেতনা দিয়েই সে পরবর্তীতে এই সমাজকে পর্যবেক্ষণ করবে, উপলব্ধি করবে এবং সর্বোপরি একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে অন্যের সঙ্গে বিবিধ সম্পর্ক স্থাপন করবে।

'পুরাণের গল্প' বলতে গিয়ে পরম্পরা-অভিজ্ঞ উপেন্দ্রকিশোর নানা পুরাণ থেকে আখ্যান সংগ্রহ করার পাশাপাশি ভারতের জাতীয় মহাকাব্য দু'টি থেকেও নানা কাহিনি ছোটোদের কাছে পেশ করার জন্য মনোনীত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের পিছনে প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, উনিশ শতকের শেষলগ্নে দাঁড়িয়ে নতুন ধর্মশাস্ত্র রচনা একেবারেই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বরং অনেক বেশি করে উপেন্দ্রকিশোর ঝুঁকেছেন সেই সমস্ত পুরাকথার দিকে যেগুলি আসলে আমাদের 'মানুষ' হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করবে। তাই তাঁর রচনায় দেবতারা তাঁদের সমস্ত অলৌকিক দৈবী শক্তিকে ঝেড়ে ফেলে হাজির হয়েছেন আমাদেরই মতো মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্বে মেশা মানুষ হিসাবে।

'ইন্দ্র হইবার সুখ" শীর্ষক কাহিনিতে দম্ভ ও দর্পের পরাজয়ের ছবি আরও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মূল মহাভারত-এর 'উদ্‌যোগ পর্ব'-এর এই আখ্যানে আমরা দেখি, নহুষ প্রথমে ধর্মপথানুসারী এক রাজা ছিলেন। প্রজাপালনে রত, সুবিনয় এই রাজাকে ইন্দ্রপদে মনোনীত করেন মহর্ষিরা। কিন্তু ক্ষমা পেয়েই তাঁর চরিত্র আমূল বদলে যায়। ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তির পড় তিনি দাবি করে বসেন, "ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা করেন না কেন? উনি সত্বর আমার গৃহে আসুন"।[১৪] ব্যথিতা শচী দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে আশ্রয় নেন ও পরে ইন্দ্রের পরামর্শে নহুষকে জানান, "দেবরাজ, আপনি যদি আমার একটি ইচ্ছা পূরণ করেন তবে আমি আপনার বশগামিনী হব। ...আমার ইচ্ছা, মহাত্মা ঋষিগণ আপনার শিবিকা বহন করুন।"[১৫] এই কথা শুনে নহুষ ঋষিদের শিবিকা বহনে নিয়োগ করেন ও ক্রুদ্ধ ঋষিদের অভিসম্পাতে বিনষ্ট হন।

অনুবাদে নহুষের এই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছবি বাদ দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর যে-ছবি তুলে ধরেন সেখানে আমরা দেখতে পাই ক্ষমতা-মদ-মত্ত এক রাজাকে। ছোটোদের জন্য লিখতে বসেছেন বলেই সম্ভবত এই শচী-প্রসঙ্গ বাদ পড়েছে উপেন্দ্রকিশোরের রচনায়। কিন্তু এখানে লেখক তাঁর ছোটো পাঠকদের খুব সহজেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন ক্ষমতার দম্ভ আসলে বিনাশই ডেকে আনে।